সূচিপত্র

১.	ক্ষীরের পুতুল	৭
২.	নালক	৪৫
৩.	শকুন্তলা	৯৫
৪.	খাতাঞ্চির খাতা	১২১

এক রাজার দুই রানী দুও আর সুও। রাজবাড়িতে সুওরানীর বড় আদর, বড় যত্ন। সুওরানী সাতমহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুওরানী মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুকে-ভরা সাত-রাজার- ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুওরানী রাজার প্রাণ!

আর দুওরানী—বড়রানী, তাঁর বড় অনাদর, অযত্ন। রাজা বিষ নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন—ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন— বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন—ছেঁড়া কাঁথা। দুওরানীর ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।

সুওরানী—ছোটরানী, তাঁরই ঘরে রাজা বারো-মাস থাকেন।

একদিন রাজা রাজমন্ত্রীকে ডেকে বললেন—মন্ত্রী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তুমি জাহাজ সাজাও।

রাজার আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখানা জাহাজ সাজাতে সাত মাস হয়ে গেল। ছ'খানা জাহাজে রাজার চাকর-বাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া-ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা নিজে যাবেন।

মন্ত্রী এসে খবর দিলেন—মহারাজ, জাহাজ প্রস্তুত।

রাজা বললেন—কাল যাব।

মন্ত্রী ঘরে গেলেন।

ছোটরানী—সুওরানী রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিলেন, সাত সখী সেবা করছিল, রাজা সেখানে গেলেন। সোনার পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোটরানীকে বললেন—রানী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কি আনব?

রানী ননীর হাতে হীরের চুড়ি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বললেন,—হীরের রঙ বড় শাদা, হাত যেন শুধু দেখায়। রক্তের মতো রাঙা আট-আট গাছা মানিকের চুড়ি পাই তো পরি।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানী, মানিকের দেশ থেকে মানিকের চুড়ি আনব।

রানী রাঙা-পা নাচিয়ে-নাচিয়ে, পায়ের নুপুর বাজিয়ে-বাজিয়ে বললেন—এ নূপুর ভালো বাজে না। আগুনের বরন নিরেট সোনার দশগাছা মল পাই তো পরি।

রাজা বললেন—সোনার দেশ থেকে তোমার পায়ের সোনার মল আনব।

রানী গলার গজমতি হার দেখিয়ে বললেন—দেখ রাজা, এ মুক্তো বড় ছোট, শুনেছি কোন দেশে পায়রার ডিমের মতো মুক্তো আছে, তারি একছড়া হার এনো।

রাজা বললেন—সাগরের মাঝে মুক্তোর রাজ্য, সেখান থেকে গলার হার আনব। আর কি আনব রানী?

দেবলঋষি যোগে বসেছিলেন। নালক—সে একটি ছোট ছেলে—ঋষির সেবা করছিল। অন্ধকার বর্ধনের বন, অন্ধকার বটগাছতলা, অন্ধকার এপার-গঙ্গা ওপার-গঙ্গা। নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না। এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল—ফুল যেমন করে ফোটে, চাঁদ যেমন করে ওঠে—একটু, একটু, আরো একটু। সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল— পদ্মপাতার জল যেমন দুলতে থাকে—এদিক-সেদিক, এধার-ওধার সে-ধার! ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চর্য আলো! চাঁদের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো! এমন আলো কেউ কখনো দেখেনি। আকাশ জুড়ে কে যেন সাত-রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। কোনো দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপর আলোর একটি-একটি ধাপ গেঁথে দিয়েছে! সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নালককে বললেন—'কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন,
আমি তাঁর দর্শন করতে চললেম, তুমি সাবধানে থেক।'

বনের মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা সরু পথ, সন্ন্যাসী সেই পথে উত্তর-মুখে চলে গেলেন। নালক চুপটি করে বটতলায় ধ্যানে বসে দেখতে

লাগল—একটির পর একটি ছবি।

কপিলবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির মঠ। আর ওধারে—অনেক দূরে হিমালয় পর্বত—শাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওধারে আকাশ-জুড়ে আশ্চর্য এক শাদা আলো; তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য উঠছেন। রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন, 'মহারাজ, কি চমৎকার স্বপ্নই দেখলেম! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা-বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না। আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মতো একটি টিপ ছিল।'

রাজা-রানী স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন, ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির নবৎখানার বাঁশি বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ আসছে, অন্দরমহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার থালায় পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রানীর পোষা ময়ূর ছাদে এসে উঠে বসল, সোনার খাঁচায় শুকশারী খাবারের জন্য দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, ভিখিরী এসে 'জয় রানীমা' বলে দরজায় দাঁড়াল। দেখতে দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রানীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি করতে লাগল। কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, মাথায় মানিকের মুকুট, পরনে লাল চেলী, সকালে সূর্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তাঁর পাশে দণ্ডধর—সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর—শ্বেতছত্তর খুলে,

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়-বড় বট, সারি-সারি তাল, তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মত। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া। নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট-ছোট পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে-ডালে গান গাইত, কোটরে-কোটরে বাসা বাঁধত। দলে-দলে হরিণ, ছোট-ছোট হরিণ-শিশু কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী-কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতকগুলি ঋষি-কুমার। তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতাদের অঞ্জলি দিত। আর কি করত?

বনে-বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো-গাই ধলো-গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল, তাতে গাই-বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল, তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়ার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণু বাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল—খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল—মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধ কথা, তাত-কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলি ছিল, ছিল না কেবল আঁধার ঘরের মাণিক ছোট মেয়ে—শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি—দুধের বাছা—শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল। বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে, কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল!

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে-বনে ফল ফুল কুড়তে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে-তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে মা-গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল তখন তাত-কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের

মনিবের খাতাঞ্চিমশায় হিসেব লিখছেন, গোলাবাড়ির কোন কোণে কি জমা হল, কোন ঘরে কি খরচ হল। কাজেই নামে গোলাবাড়ি হলেও সেখানে কেউ যে 'দে টপাটপ নে টপাটপ ভাবনা কিছু নেই' বলে বেহিসাবি কাণ্ড করে হিসেব গোল করবে, তার জোটি নেই। খাতাঞ্চিমশায় অমনি খাতায় তোমার নামে হাওলাত টানলেন, আর অমনি মাসের শেষে তোমার মাইনের টাকা কখনো চার আনা কখনো পাঁচ সিকে এমন কি পুরো পাঁচ টাকাই কমে গেল। দুচারটে রসগোল্লা বেশি খেয়ে ফেললে মাইনের টাকা কেন যে কমে যাবে, এটা সোনাতোন ছোঁড়া গোলাবাড়িতে চুল পাকিয়েও বুঝতে পারলে না। কাজেই এদানিং সে খাতাঞ্চির দোয়াতদানির কাছ থেকে কেবলি হাওলাত নিয়ে চলেছে, মাইনের আশা একেবারেই করে না।

সেদিন খাতাঞ্চির জমাখরচের ঘরের বাইরে জানলার ধারে ফাগুন মাসের কৌ-গাছের মৌ লুট করে মৌমাছিটা গুন-গুন করে কেবলি বাজে বকে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় বৌঠাকরুণের প্রথম সোনা মেয়েটি জন্মেই, শুধু শুধু কেবলি দুধ খাবার, কাপড় পরবার, দাঁত ওঠাবার, কান বিঁধোবার, ওষুধ খাবার, খেলাঘর পাতবার, শ্বশুরবাড়ি যাবার, আবার দুগগো পুজোয় বাপেরবাড়ি আসবার, এমনি নানা ছুতোয় কান্না শুরু করে দিলে যে সোনাতোনের আর হাসি ধরে না।

সে খাতাঞ্চিমশায়ের কাছে ছুটে এসে বলল, "কর্তার মেয়ে হল, এবার বকশিশ চাই।"

খাতাঞ্চি তাকে ধমকে বললেন, "বাজে বকচিস্ ফের?" তারপর সোনাতোনের হাতে একটি আধলা পয়সা দিয়ে খরচের ঘরে খাতায় লিখলেন—প্রথম কন্যার জন্মোপলক্ষে বকশিশ বাবদ বাজে খরচ আধ পয়সা! অমনি মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। একটু ভেবে খাতাঞ্চি খরচের পাতায় জের টানলেন—সোনাতোনের হাওলাত বাদে তাহার গতবৎসরের মাহিনা দেওয়া যায় আধ পয়সা। কিন্তু এতেও বাজে খরচ বন্ধ হওয়া দায়, এবার খাতাঞ্চিমশায় বেশ বুঝলেন।

পাঁচদিন ধরে খাতাঞ্চিমশায়ের মেজাজ খিটখিটে হয়েই রইল। তিনি কেবলি বিড়-বিড় করতে লাগলেন—কুড়িতে বুড়ি, তা হলে রোস, তা হলে এই কুড়ি গণ্ডায় একপণ; একপণ একপণ দুইপণ, আর তিনপণ হলে হল আটপণ, আটের উপর আর একপণ কিংবা আর এক মেয়ে হলে হল নপণ; তা হলে হাতে রইল এই দুই চোখ! খাতাঞ্চিমশায় চশমা জোড়া হাতে করে মেয়ের বাজে খরচ মনে-মনে ঠিক দিতে লেগেছেন—গিন্নীর বরাদ্দ একসের দুধের থেকে কেটে রাখা যাক আধসের, আর আমার আফিঙের ক্ষীর থেকে, না হয় চায়ের ঘন দুধ থেকে, দিনে চার ছটাক—এই পাওয়া গেল মেয়েটার জন্যে মোটের উপর তিনবেলায় তিন পোয়া দুধ। তারপর দুজনের জন্যে যে দুটো কৈ মাছ আনা যায় এখন থেকে তা না করে, গিন্নীর জন্যে চুনো পুঁটি আর আমার জন্যে যদি একটা বাগদা চিংড়ি বরাদ্দ করে দেওয়া যায়, তবে আর একটা মেয়ের মাথায় দেবার তেলটার খরচ চলতে পারে; আর হাতেও কিছু জমে—মাটির পুতুলটা, রাঙা চুড়িটা, সোনার পাখিটা কিনতে। কাপড়ের দর যে রকম বেড়েছে, তাতে করে